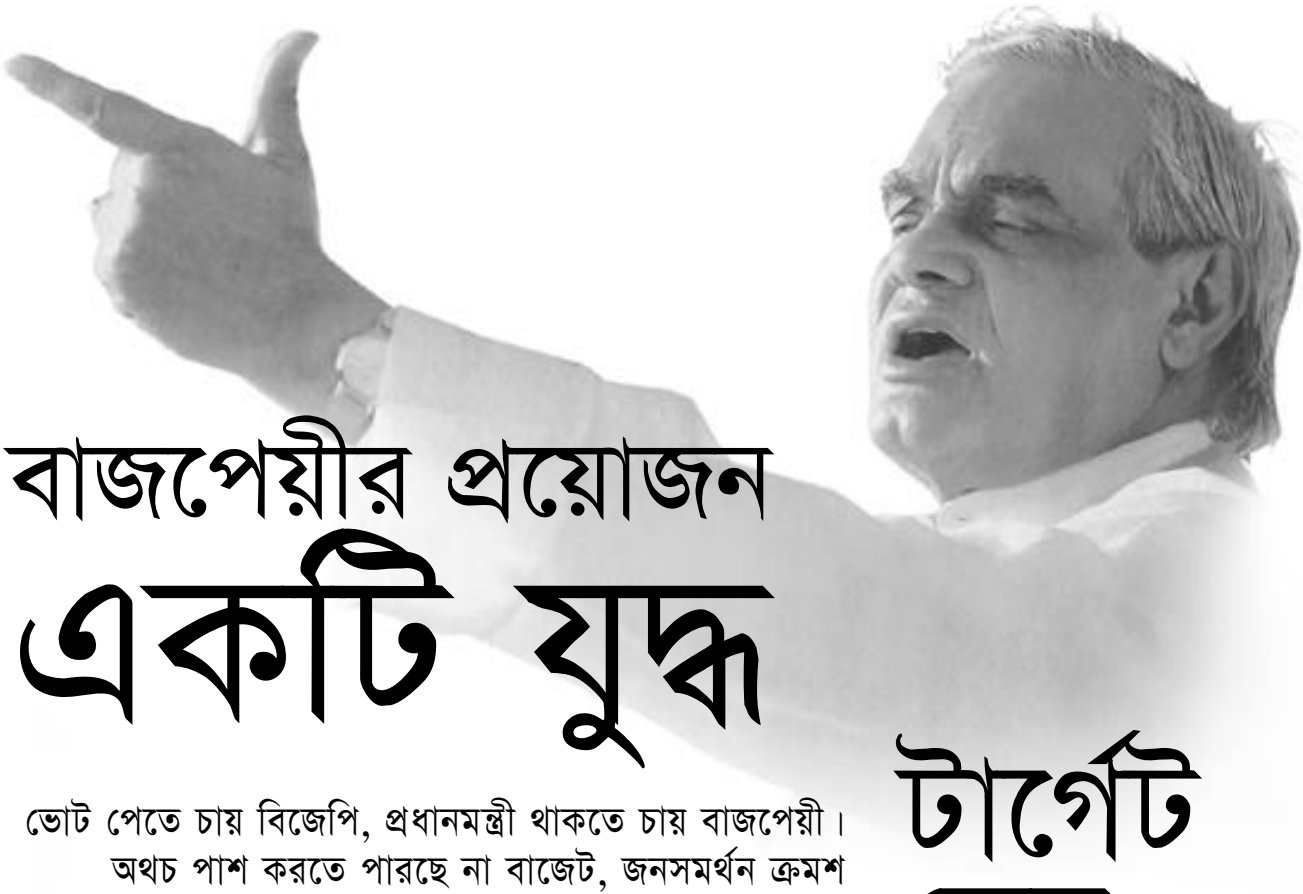

বাজপেয়ীর প্রয়োজন একটি যুদ্ধ টার্গেট কেন বাংলাদেশ

ভোট পেতে চায় বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী থাকতে চায় বাজপেয়ী। অথচ পাশ করতে পারছে না বাজেট, জনসমর্থন ক্রমশ কমছে। নিজেদের পতন ঠেকাতে বিজেপি ভারতবাসীর চোখ ফেরাতে চায় অন্যদিকে। তারা বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকে। নিজেরা আক্রমণ করে এখন বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার প্রোপাগান্ডায় মেতে উঠেছে ভারত ... লিখেছেন **খসরু চৌধুরী**

নির্বাচন এবং ক্ষমতা অনেক সম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং যুদ্ধের কারণ— উপমহাদেশের ক্ষেত্রে কথাটির জোরালো ভিত্তি রয়েছে। এই অঞ্চলের জনগণ খুব বেশি সচেতন না হলেও এদের দেশপ্রেম তুঙ্গে। এই সুযোগগুলোই নেয় রাজনৈতিক দলগুলো। সরকার যখন টালমাটাল অবস্থায় পড়ে, তখনই যুদ্ধ বা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করে ক্ষমতাসীন সরকার। অতীতে এমন নজির অনেক আছে।

বাজপেয়ী সরকার এখন বিপদে আছে। বেশ বড় রকমের বিপদ তার সামনে। ঘুষ কেলেঙ্কারি ধরা পড়ায় প্রথম বিপদে পড়ে। বাজেট পাস করতে পারছিল না। আরো অনেক ছোটখাটো সমস্যা ছিল। এরকম একটি সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ভারত একের পর এক উসকানিমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছে। চলমান ঘটনা জন্ম দিচ্ছে অনেক প্রশ্নের। প্রশ্নের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসছে অনেক বিষয়। যা শুরুতে বলা হয়েছে। বাজপেয়ি মানুষের নজর ফেরাতে চান অন্যদিকে। থাকতে চান ক্ষমতায়। আর এর বলি হতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। ভারতের বাজেট পাস হলেই সীমান্ত সংঘাত অনেকখানি কমে যাবে। আগামী ১০ মে ভারতের ৫ রাজ্যে নির্বাচন। তবে এই নির্বাচন পর্যন্ত সীমান্ত উত্তেজনা টিকিয়ে রাখবে ভারত।

মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে পাদুয়া গ্রামটি ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় পড়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। সে অনুযায়ী তখনকার ইপিআর বাহিনীর একটি ক্যাম্পও স্থাপিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সীমারেখার ১২৭০ নম্বর সীমানা পিলারের ৫শ' গজ ভেতরে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্পটি মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেকালে গ্রামটিতে জনবসতি প্রায় ছিলই না। গ্রামটি থেকে কোনো সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থাও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের পর এলাকাটি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর হয়নি। উপরন্তু বিএসএফ এলাকাটিতে পথ ক্যাম্প বসিয়ে ৮০০ খাসিয়া গ্রামবাসীর পুঞ্জী গড়ে তোলে। গ্রামটির দক্ষিণে পিয়াং নামের একটি ছোট নদী আছে। ভারতীয়দের জানিয়ে বিডিআর বাহিনী মাঝে মাঝে সেখানে টহলে যেত। গত ১১ এপ্রিল বিডিআর বাহিনী দেখতে পায় আন্তর্জাতিক সীমারেখার মাত্র ৩০ গজের মধ্যে বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে সংযোগ সড়ক তৈরি করা হচ্ছে। অথচ ১৯৭৫ সালের চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো পক্ষই কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। প্রতিপক্ষকে প্রতিবাদ জানায় বিডিআর। নানা অজুহাতে বিএসএফ সেটা এড়িয়ে যায়। ভারতীয়দের অনড় মনোভাবে বিডিআর ১৫ এপ্রিল পাদুয়া দখল নেয় বিনা রক্তপাতে। বিএসএফ ক্যাম্পের ৩০ জন

'অঘটনের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দু'দেশ বিষয়টিকে যেভাবে সামাল দিয়েছে তাতে পরস্পরের সমঝোতা ও বিশ্বাসই প্রকাশ পায়। বিষয়টির দ্রুত সমাধায় তাদের সদিচ্ছারই প্রমাণ রাখে।'

— আর এস জামাল, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র

সদস্যকে সরে যাবার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তে ১৯ এপ্রিল বিডিআর পাদুয়া ছেড়ে আসে। পাদুয়ার ঘটনায় বিএসএফ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। প্রতিশোধ নিতে পাদুয়া থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে ১৮ এপ্রিল ভোররাতে রৌমারী উপজেলার বড়ইবাড়ী গ্রামে বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করতে এসে প্রচন্ড পাল্টা মার খেয়ে পালিয়ে যায়। রেখে যায় ১৬টি লাশ। বিডিআরের দুই সদস্যও মৃত্যুবরণ করে।

এই ঘটনার পর উভয় দেশের প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে আলোচনায় পারস্পরিক হামলা আপাতত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারত নিয়মিত সেল নিক্ষেপ করে যাচ্ছে, বাংলাদেশী গ্রাম জ্বালাচ্ছে। সেই সঙ্গে বিএসএফ-এর সঙ্গে নিয়মিত বাহিনীর বিরাট সমাবেশ করেছে আন্তর্জাতিক সীমানায়। চলছে নিষ্প্রদীপ মহড়া। তৈরি করা হয়েছে যুদ্ধের আবহ। উভয় দেশের মধ্যেও উসকানো হচ্ছে মৌলবাদীদের। দিল্লিতে বাংলাদেশের পতাকা পোড়ায় শিবসেনা বাংলাদেশ মিশনের সামনে, আবার বাংলাদেশের মৌলবাদীরা ভারতীয় পতাকা পোড়ায় ঢাকায়। যুদ্ধংদেহী করে তোলা হয় সাধারণ মানুষ, মিডিয়াকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিশ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ দুটো দেশকে কারা যুদ্ধংদেহী করে তুলছে? কাদের স্বার্থে উভয় দেশের নিরীহ মানুষ জীবন-সম্পত্তি হারাচ্ছে? কে বা কারা দায়ী?

যুদ্ধ এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা যে সময় যুঝমান দেশগুলোর মধ্যে সমস্ত রকম মানবিক সম্পর্ক লোপ পায়। মানুষের অন্তরে যত ধরনের হিংস্রতার বীজ সুপ্ত থাকে, যুদ্ধ সেগুলো একে একে বের করে নিয়ে আসে। যুদ্ধ জয়ের জন্য সব অপরাধই অনুমোদন করা হয়। সব বীভৎসতা, হিংসা যুদ্ধের আবশ্যকীয় উপাদান।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায় বিবাদে, আর ধনে প্রাণে মারা পড়েছে উলুখাগড়া বা সাধারণ জনসাধারণ।

প্রাচীন পৃথিবীতে যুদ্ধ হতো চারণভূমি দখল, জাত্যাভিমানকে কেন্দ্র করে। মধ্য যুগের যুদ্ধের পেছনে ধর্মের ইন্ধন ছিল সবচেয়ে বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যুদ্ধের বর্তমান সময় পর্যন্ত যুদ্ধের মূল কারণ হচ্ছে উদ্বৃত্ত পণ্যের বাজার নিয়ে।

মানুষের ভাবাবেগের সর্বোচ্চ প্রকাশ দেশপ্রেম। প্রাচীন কাল থেকেই দেশের ধনিক এবং বণিক সম্প্রদায় একে ব্যবহার করে আসছে সর্বোচ্চ উন্মাদনায়। যুদ্ধের মাধ্যমে জনসাধারণের মন দেশের সমস্ত সমস্যা থেকে অন্যদিকে ফেরানো যায়। সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান জনসাধারণ ভুলে যায়। জনসাধারণের ওপর সব ধরনের কৃচ্ছ্রতা চাপিয়ে দেয়া যায়। একটি দেশের শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশের জনসাধারণের কাছে বিব্রত হলেই যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান গুছিয়ে নেবার সুযোগ পায়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিরুদ্ধাচারী রাজনৈতিক দলও এই আবেগের হাওয়ায় পাল না তুললে দেশদ্রোহী আখ্যা পায়। আপাত দমিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে দুর্বল সাংগঠনিক শাসকগোষ্ঠীর অবস্থান সংহতকরণের জন্য একটি যুদ্ধের ছলছুতো খোঁজে। অবশ্যই সেই যুদ্ধটা চাপিয়ে দেয়া হয় দুর্বল প্রতিবেশীর ওপর। কারণ পরাজিত হলে জনসাধারণ সেই সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে। এই সহজ অথচ মোক্ষম সমীকরণ আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগেও সমান কার্যক্ষম। তাই রিপাবলিকান বুশ ক্ষমতায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বোমা পড়ে বাগদাদে। চীনের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করা হয় মার্কিন অর্থনীতির বিপর্যয় থেকে দেশবাসীর মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য।

বাজপেয়ীর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একজন ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠার তিন দশক পর এর পূর্ণ নেতৃত্ব চলে আসে ভারতবাসীর হাতে। কংগ্রেস পরিণত হয় ভারতীয় জনসাধারণের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে। যদিও বহুকাল কংগ্রেস ব্যবহৃত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী হিসেবে। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে সব ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠেছিল দাদাভাই নওরোজী, গোখলে প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসী সংস্পর্শ থেকে কংগ্রেসকে বিরত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সর্বভারতীয় জাতিগোষ্ঠী এর পতাকাতলে সমবেত হয়। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে চলে আসেন। তার আদর্শের চমক একদিকে যেমন ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের মানুষজনকে টানতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি জড় হয়েছিল তদানীন্তন ভারতীয় উঠতি পাঁতি টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কারা। ব্রিটিশ সরকারও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। কারণ তারা ভেবেছিল, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চীনের মত ভারতবর্ষের দিকে ধেয়ে এলে কংগ্রেস ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসাবটা ওলটপালট করে দেয়। রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাতের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এর মাধ্যমে সিপিআই এমন একটি দলে পরিণত হয়, যেটি কংগ্রেস বাদে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার সর্বভারতীয় সাংগঠনিক ভিত্তি আছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর রাজনীতি ফুরিয়ে যায়, এদেরই একটি অংশ হিন্দু মৌলবাদী প্রতিষ্ঠান হিন্দু সভায় যোগ দেয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত কংগ্রেস কেন্দ্রে একনাগাড়ে শাসন করে। এর মাঝে ১৯৭৪ সালে জরুরি অবস্থা জারিজনিত অবমাননাকর পরিস্থিতির কারণে বছরখানেক ক্ষমতার বাইরে ছিলো কংগ্রেস। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ক্ষমতায় এসেছিল দক্ষিণপন্থি, কট্টর মৌলবাদীদের সমর্থনে। কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসেন। তিনি নিহত হলে তার পুত্র রাজীব গান্ধী এবং তিনিও নিহত হলে কংগ্রেস

রাজনীতি থেকে নেহরু ডায়নেস্টির অবসান হয়। উপমহাদেশীয় রাজনীতিক, জনগণ গণতন্ত্রের সংগ্রাম করলেও তারা ডায়নেস্টি ভক্ত। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এমনকি শ্রীলংকাতেও জনতার একই চরিত্র দেখা যায়। নেহরু ডায়নেস্টির পতনে কেন্দ্রে দুর্বল কংগ্রেস নেতৃত্ব বার বার বিপর্যস্ত হলে ক্ষমতায় চলে আসে মৌলবাদী হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ, আরএসপি, শিবসেনা সমর্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি। এদের কোয়ালিশনে যোগ দেয় দলচ্যুত কংগ্রেসী, তেলেগু দেশম, আন্না ডিএমকে, আকালী দলের একাংশসহ কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী দল। এই হ-য-ব-র-ল কোয়ালিশনের খাই মেটাতে এবং দুর্বল সাংগঠনিক অবস্থানের (ভারতের সর্বত্র এখনও পর্যন্ত বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থান নেই) কথা চিন্তা করেই বাজপেয়ীকে দু'টি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে হয়। বাজপেয়ী সরকারের ডিজাইন অনুযায়ী অপরপক্ষে ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানও বোমা ফাটালে নাটক জমে ওঠে। বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেকেই এগিয়ে আসে। কিন্তু এ সুসময় বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। উন্মাদনা কমে এলে বিজেপির প্রশাসনিক অদক্ষতা বেরিয়ে আসে। শরিক দলগুলোর একের পর এক আবদারে বিজেপির পতন ঘনিয়ে এলে বাজপেয়ীর দরকার পড়ে কারগিল যুদ্ধের। এটা এমন একটা যুদ্ধ, যেটায় বড় রকমের বিপর্যয়ের শংঙ্কা নেই, অথচ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটাও চলে। ফলে পরবর্তী ভোটে খাই খাই করা কয়েকটি শরিক দলকে ছেঁটে বিজেপি কিছুটা ভারমুক্ত হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু তাদের মূল শত্রু কংগ্রেস নেতৃত্ব অসংঘত হলেও ভারতব্যাপী তাদের গ্রাসরুটের বিশাল কর্মী বাহনীকে বিজেপি ভয় পায়। ২২ দলীয় শরিকদের নিয়ে ৭২ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার যে জোট তৈরি করে ক্ষমতা সংহত করণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ, কারগিল যুদ্ধ এদের আংশিক সাফল্য এনে দিলে বিজেপি তাদের নেতাদের ভাবমূর্তি গড়তে লেগে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানীর দরকার ছিল আয়রনম্যান ইমেজের। যদিও উগ্র শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকারকে সামলাতে তিনি ব্যর্থ হন। পশ্চিমা বিশ্বের কাছে মৌলবাদী ইমেজ কাটিয়ে গণতন্ত্রী প্রমাণ করার দরকার ছিল বাজপেয়ীর, যেটা তিনি বোমা ফাটিয়ে নষ্ট করেছিলেন। ইমেজ পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে সহায়তা, কাশ্মীরি চরমপন্থিদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি করে শান্তি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।

ভারতের একটা বিরাট সমস্যা হল, প্রতিবেশী একটি দেশের সঙ্গেও তাদের

'নিষ্ঠুর হত্যা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। ৮টি মৃতদেহে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করার স্পষ্ট চিহ্ন আছে, পাশাপাশি অন্যান্য আঘাতের চিহ্নও আছে। একটি জওয়ান শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে বলে বোঝা যায়।... এটা বিডিআরের একক সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশী সরকার এখানে জড়িত ছিল না।'

– কমল পান্ডে, ভারতীয় স্বরাষ্ট্র সচিব

সুসম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় ভারত যখন একজন শক্তিশালী একক নেতৃত্বের মানুষ খুঁজছিল বাজপেয়ী তার মিঃ ক্লিন ইমেজের কারণে সেখানে অনেকটা পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই স্বপ্নের বেলুনে পিন ফুটিয়ে দেয় তেহেলকা ডট কম। তেহেলকা প্রমাণ করে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অস্ত্র কিনতে অনেক দুর্নীতি করেছে এবং এর সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ অনেকেই জড়িত। বাধ্য হয়ে বাজপেয়ী প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকে সরিয়ে দেন। সেই সঙ্গে ঘুষ গ্রহণের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে এ সুযোগ হাতছাড়া করার উপায় নেই। কারণ বোফর্স কেলেঙ্কারিতেই তাদের সরকারের পতন ঘটেছিল। তারা দাবি করেন সংসদীয় কমিটির তদন্ত। এ অবস্থায় বাজপেয়ী সরকার আরও দুটি সমস্যার সম্মুখীন হন, যেগুলোর ফলাফল নিজেদের দিকে টানতে না পারলে তাদের সরকারের পতন অনিবার্য। একটি হচ্ছে, বর্তমান অর্থবছরের বাজেট পাস, অন্যটি ভারতের চারটি রাজ্য ও একটি ইউনিয়ন এলাকার আসন্ন নির্বাচন। তেহেলকা ডট কমের দুর্নীতি উন্মোচনের সঙ্গে বাজেট এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে বাজপেয়ী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অবস্থাটা নিরূপণের আগে ভারতীয় রাজনীতিতে খেলোয়াড় দলগুলোর অবস্থান বিশ্লেষণ দরকার।

ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত দল কংগ্রেস। অথচ তাদের স্বমহিম কোনো নেতা নেই, আছে মধ্যমসারির একদল নেতা আর বিশাল কর্মী বাহিনী। বাধ্য হয়ে ১৯৯৮ সালে আত্মাভিমানী কংগ্রেস পাচমারহীতে ঘোষণা দেয়, বর্তমান অবস্থায় একদলীয় সরকার গঠন সম্ভব নয়; অবস্থায় কংগ্রেস শুধু তাদের সঙ্গেই জোট গড়বে যারা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে এ ধরনের মনোভাব রক্ষা করে দলের উচ্চাভিলাষী নেতা-কর্মীদের ধরে রাখা সম্ভব নয়। ফলে শরদ পাওয়ার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেতানেত্রী দল থেকে সরে পড়েন। এ অবস্থায় কংগ্রেসের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নেতৃত্বের বোধোদয় হয় আদর্শিক মিল নয়, স্বার্থের মিলের জোটের সমন্বয়ে ক্ষমতায় যেতে না পারলে দল বিপর্যস্ত হবে। সামনে পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে আসাম এবং কেরালায় তারা সরকার গঠন করতে পারবে বলে তারা আশাবাদী।

তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে নেত্রী জয়ললিতাকে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী পছন্দ করেন না। ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে জয়ললিতা নির্বাচনে দাঁড়ানোর অযোগ্য ঘোষিত হলেও তার দল যথেষ্ট শক্তিশালী। এ অবস্থায় কংগ্রেস হাত বাড়িয়েছিল তামিল মানিলা কংগ্রেস নেতা জিকে মুনপারের দিকে। কারণ তার নেহরু পরিবারের প্রতি সহানুভূতি আছে। কিন্তু জয়ললিতা তার আগেই কংগ্রেস ও টিএমসিকে ৪০টি আসন

দেবার কথা জানান। টিএমসিকে'র নিজেদের আসন আছে মোট ৩৭টি। তারা কাকে বাদ দেবে এ নিয়ে ফাঁপড়ে পড়ে গেছে নেতা-কর্মীরা। ফলে বাধ্য হয়ে সোনিয়া আঁতাত খুঁজছেন পিএমকে (পাত্তালী মাক্কাল কাটচি) দলের সঙ্গে। এরা আবার এলটিটিই'র প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কংগ্রেসকে বিপাকে পেয়ে এরা অসম্মানজনক প্রস্তাবও দিয়েছেন ইউনিয়ন টেরিটোরির পন্ডিচেরির নির্বাচন নিয়ে। পন্ডিচেরিতে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেই এরা কংগ্রেসকে সমর্থন দেবে।

এবার আশা যাক পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায়। ১৯৯৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনে মমতা থাকাকালীন কংগ্রেস পেয়েছিল ৮৩টি আসন। গত নির্বাচনে তৃণমূল পৃথক হয়ে গেলে সেটা হয়ে পড়ে ৫২টি। তৃণমূলের ভোটব্যাংক শহর কলকাতা এবং দক্ষিণ পশ্চিম চব্বিশপরগনা। আর কংগ্রেসের ভোটব্যাংক মুসলিম প্রধান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চাচ্ছিলেন তাদের ধর্মনিরপেক্ষ ইমেজ অক্ষত রাখতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল সঞ্জয় গান্ধীর চেলা হিসেবে পরিচিত কমল নাথকে। তার প্ররোচনায় দলের ৫২ সাংসদের ২২ জন সৌগত রায়ের নেতৃত্বে সোনিয়াকে জানান, বামফ্রন্টকে সরাতে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত না করলে তারা দল ছাড়বেন। এ ধরনের জোট বিরোধী ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং গণিখান চৌধুরী। কমলনাথ এদের এড়িয়ে মমতার সঙ্গে জোট বাঁধতে সোনিয়াকে রাজি করান। গণি চৌধুরী বেঁকে বসলে প্রণব মুখোপাধ্যায়কেই তাকে ঠান্ডা করতে পাঠানো হয়। গণি চৌধুরী গোঁ ধরেছেন যদিও আমাদের বাবা একই– ঐ মহাত্মা গান্ধী, কিন্তু মমতা বিজেপি কানেকশন না ছাড়লে তাকে সমর্থন করা কংগ্রেসের পরাজয়।

এদিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বিজেপি। তারা ভাল করেই জানে এই পাঁচটি রাজ্যে সরকার গঠনের অবস্থায় তো দূরের কথা, নির্বাচনে সম্মানজনক ফলাফল করার মত সাংগঠনিক শক্তি, সামর্থ্যও তাদের নেই। তাদের একমাত্র লাভ হচ্ছে এলাকাগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি করা। তাদের হিসাব হচ্ছে মমতা গংয়ের মাধ্যমে তারা যদি বামফ্রন্টকে হটাতে পারে সেটা হবে বিরাট বিজয়। কারণ মমতা ক্ষমতায় গেলেও শরিক দলগুলোর চাপে এবং ব্যক্তিগত উদ্ধত আচরণ, হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং তার সাংসদদের প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণেই তার সরকার ভেঙে পড়বে। তেহেলকার নাম করে মমতা তাদের ছেড়ে এলেও তারা মমতার ডেমোগ্রাফি না বদলানোর অঙ্গীকার (মমতার অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে অন্ততপক্ষে এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ করে তাদের ডেমোগ্রাফি বদলে দিচ্ছে। কারণ এই অনুপ্রবেশকারীরা নাকি মুসলমান এবং বামফ্রন্টের সহায়তাপ্রাপ্ত) সমর্থন করছে। বিজেপির ধারণা, মমতা ক্ষমতায় এসে ক্ষমতা হারালে, জনগণ হতোদ্যম হয়ে আঞ্চলিক দল ছেড়ে সর্বভারতীয় দল বিজেপিকে বেছে নেবে পরবর্তী নির্বাচনে। কিন্তু তেহেলকা ডট কমের ঘুষ কেলেঙ্কারি ফাঁস এবং বাজেট অবস্থান তাদের হিসাব গুবলেট করে দিয়েছে।

প্রলোভনের বাজেট

১০০ কোটি রুপি বৃদ্ধ গরিব স্বজনহীন জনসাধারণের মধ্যে মাসিক ৭৫ টাকা হারে বিতরণ। প্রকল্পের নাম অন্নপূর্ণ ফুডস্কিম। বিরুদ্ধবাদীরা একে পুরনো পেননস্কিমের সংস্করণ বলছেন। সবার জন্য বাড়ি প্রকল্পের বরাদ্দ ১৭১০ কোটি রুপি। মোট ২০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ। গ্রামে ১৩ লক্ষ এবং শহরে ৭ লক্ষ।

দেখা গেছে, গত বাজেটে ৯.৮৭ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। হয়েছে মাত্র ৩৫%। ২০০৪ সালের মধ্যে পানীয়জলের সমস্যা সমাধান প্রকল্প। বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা ছিল রাজীব গান্ধীর। কিন্তু এ পর্যন্ত নেয়া পানি সরবরাহ প্রকল্প কখনোই সফল হয়নি।

প্রকল্প : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সাদক যোজনা। ১০০০ জন বাস করে এমন গ্রামে ২০০৩ সালের মধ্যে এবং ৫০০ জন বসবাস করে এমন গ্রামের জন্য ২০০৭ সলের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা। বরাদ্দ টাকা ২,৫০০ কোটি রুপি। টাকা কোথা থেকে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই।

এবার মূল বাজেটে আসা যাক।

১. ভর্তুকি কমানো হবে না– বিজেপি। কংগ্রেস সাংসদ প্রণব মুখার্জীর ভাষ্য। ঠিক আছে, কিন্তু এর জন্য সর্বদলীয় সমঝোতার দরকার। তেলেগু দেশমের কে ইরান নাইডুর ভাষ্য: না, ভর্তুকি দরকার আছে, কিন্তু কৃষকরা কি করবেন?

আকালী দলের সুখদেব সিং ধিন্ধিসা বলেন, না আজকের ভর্তুকি আগামীর ভোটে পরিণত হয়। কৃষকের ওপর উদ্বৃত্ত ভর্তুকি চাপানো চলবে না।

২. মন্ত্রিপরিষদের আকার ছোট করা চলবে না। কংগ্রেস বলছে, এটা প্রশাসনিক অদক্ষতার পরিচয়। তামিল মানিলা কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় লোকদল প্রস্তাব সমর্থন করছে।

৩. ব্যক্তিমালিকানায় আরও শিল্প ছেড়ে দেয়া হবে।

৪. রুগ্‌ণ শিল্প বাঁচাতে হবে। অবশ্য বিজেপিরই একটা অংশ এর বিরোধিতা করছে।

৫. রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে মতবিরোধ নেই, তবে কয়েকটি দল সাবধান করে দিয়েছে এটা করতে গিয়ে দেশ বিক্রি না করা হয় যেন।

৬. যাদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা নেই তাদের ওপর রাজস্ব চাপানো হবে না। সিপিআইএমের মুখপাত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য, ঠিক আছে, কিন্তু গ্রামীণ ধনীদের ওপর কর আরোপ করতে হবে।

ভারতীয় বাজেট ২০০১-এর মূল বিষয়গুলো ছিল এরকম। ইতিমধ্যে রেল বাজেট কণ্ঠ ভোটে পাস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা বাজেট নিয়ে ঘাপলা শুরু হয়েছে। কংগ্রেস বলছে, তেহেলকা ডট কম উত্থাপিত ঘুষ কেলেঙ্কারীর আগে বিচার হোক। না হলে এ সরকারের বাজেট পেশের অধিকার নেই। আমরা সংসদীয় কমিটির তদন্ত চাচ্ছি। বাজপেয়ী বলছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছেই, দুটো তদন্ত একসাথে চলতে পারে না। বাজপেয়ি এ পথে এগোনো সুবিধার মনে না করে সোনিয়া ও তার স্বামী শ্বশুর কুলকে আক্রমণ করে সোনিয়াকে উত্তেজিত করে তুলেছেন। তিনি হয়তো ভালো করেই জানেন তেহেলকা ডট কমের অভিযোগ প্রমাণিত হবে। এ অবস্থায় তার সরকার পরিত্রাণ পেতে পারেন একটি যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। দেশবাসীর চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে।

কেন টার্গেট বাংলাদেশ

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় বাজপেয়ি প্রথমদিকে কিছু জনসমর্থন পেলেও পরবর্তীতে সেটা ধরে রাখা যায়নি। বরং বোমা ফাটানোর বিপরীতে পাকিস্তান বোমা ফাটিয়ে তার মুখ কিছুটা ঘষে দিয়েছে। কারগিলের ঘটনায় লাভের মধ্যে হয়েছে পাকিস্তানে সামরিক সরকার আসার পথ করে দেয়া। সেক্ষেত্রে পূর্ব সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করলে দুটো লাভ পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত বামফ্রন্টকে ঘায়েল করা যাবে কারণ তারা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে প্রতিষ্ঠিত। তার ওপর ভারত বাংলাদেশের চার হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় (সাড়ে ছয় কিলোমিটার অচিহ্নিত) ভারতের দাবি অনুযায়ী তাদের যে ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের যে ৫১টি ছিটমহল ভারতে রয়েছে সেটার নিষ্পত্তির জন্য ১৯৭৩ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য বামফ্রন্টের অনীহাকে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলাদেশ বিরোধী সিল এঁটে দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য বামফ্রন্টের কিছুটা সময়ক্ষেপণকে দায়ী করা চলে। কিন্তু ছিটমহলগুলোর মীমাংসা হলে বেশ কয়েক

লক্ষ মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা বামফ্রন্টকে করতে হবে বলে তারা বিপদে পড়বে। বিজেপিও এটাই চায়।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, নরম মাটিতে বিলাই আঁচড়ায়। স্বাধীনতার ৩০ বছরের মধ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর হাতে অন্তত হাজারখানেক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে, ইলোপ করা হয়েছে অনেককে, ঘরবাড়ি জ্বালানো, নির্যাতন, ধান কেটে নেয়া, গরু-বাছুর ছিনিয়ে নেয়া এদের নৈমিত্তিক কান্ড। বিডিআর কখনো বাধা দিয়েছে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে, আবার অবস্থা একই আকার ধারণ করেছে। কিন্তু পাদুয়া, বিশেষ করে বড়ইবাড়ী ঘটনার পর বাজপেয়ী ভাব করছেন তিনি কিছুই জানতেন না। তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের চেলারা রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, শিবসেনারা যুদ্ধের হুঙ্কার দিচ্ছে। এদিকে ভারতীয় মিডিয়ায়ও যখন প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা নিহত হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে। সেক্ষেত্রে তাদের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু তারা ছুঁতো বের করেছেন যে, মৃত সৈনিকদের ধৃত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। এবং তাদের দেহ অসম্মানজনকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অথচ বড়ইবাড়ী সীমান্তের ওপাড়ের গ্রাম কাকড়ীপাড় থেকে হিন্দুস্তান টাইমসের সংবাদদাতা গ্রামবাসীর কাছ থেকে জেনেছেন যে, পাদুয়া শোধ নিতেই বিএসএফের ২০ জনের একটি দল ভোর ৪.৩০ মিনিটে বিডিআর ক্যাম্প দখলে যায়। এদের রিএন ফোর্স হিসেবে আর একটি ২০ সদস্যের দলও ঢুকে পড়ে। তাদের পিছু পিছু আসে আটজনের আর একটি দল। গ্রামবাসীর ধারণা, প্রথম দলটি গ্রামবাসীর দ্বারা ঘেরাও হলে বিডিআর সুবিধাজনক স্থানে অ্যামবুশে অপেক্ষা করে। কিছু সময় পরই কাকড়ীপুর এবং ঠাকুরানবাড়ীর গ্রামবাসীরা দেখতে পায়, কয়েকজন বিএসএফের জওয়ান দৌড়ে পালাচ্ছে। এরা ১৯ তারিখে আরও দেখতে পায় যে, তিনজন বিএসএফ জওয়ানের দেহ বিএসএফের লোকজন তুরা হাসপাতালে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এসব ঘটনা প্রকাশিত হবার পর ভারতীয়রা অজুহাত তুলছে, বাংলাদেশের মত বন্ধুপ্রতীম দেশের এ ধরনের আচরণের পেছনে রয়েছে আইএসআই-এর হাত। তারা দায়ী করছে বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে। তাদের ভাষ্য, তিনি যদিও মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং শেখ হাসিনার দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষিত এবং ইসলাম ভাবাপন্ন দলগুলোর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। ভারতীয় পক্ষ কৌশল নিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারকে সেনাবাহিনী হতে পৃথক করতে। তারা শেখ হাসিনা সরকারকে বন্ধুভাবাপন্ন মনে করেন কিন্তু তাদের ধারণায় (দি হিন্দু ১৯ এপ্রিল, প্রতিবেদক অতুল আনেজা) যদিও শেখ হাসিনা সরকারের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং মূল শক্তি ঢাকাস্থ নবম পদাতিক ডিভিশন এবং বগুড়ার এগারোতম ডিভিশন পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যম র‍্যাঙ্কের অফিসাররা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে। এবং তাদের নিয়ে ভাবতে হবে। ধারণা করা হয়, নেপালে পাকিস্তানি ফার্স্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ আরশাদ চিমার বাড়িতে ১৬ কেজি বিস্ফোরক পাওয়া গেলে তাকে ডিটেনশন দেয়া হয়। এটা আবিষ্কার করে ভারতীয় গোয়েন্দারা। তারই প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানি আইএসআই তাদের বন্ধুপ্রতীম অফিসারদের লেলিয়ে দেয় ভারতের বিরুদ্ধে।

ভারতীয়দের এই প্রপাগান্ডার সঙ্গে কারগিল ঘটনার মিল পাওয়া যায়। সেখনে নেওয়াজ শরিফকে নির্দোষ প্রমাণ করে জেনারেল পারভেজকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তার পরিণামে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত হয়েছে। হাসিনা সরকারকেও প্রথম থেকেই তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে এ ঘটনা সরকার প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ হাসিনার অগোচরে ঘটেছে। এ তথ্য কিন্তু বন্ধুত্বের পক্ষে যায় না। তারা এও মন্তব্য করেছেন, এ মুহূর্তের বিডিআর প্রধানকে বরখাস্ত করলে নির্বাচনে সেটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যাবে। অথচ তাদের লোক-দেখানো বন্ধুত্বের চাপে পড়ে যে আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেনাবাহিনী সংক্রান্ত সংবাদ যে উসকানিমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেটা দিন দিন পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

এও পরিষ্কার হয়ে উঠছে বাজপেয়ীর এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলবে যতদিন না তিনি তেহেলকার আঘাত কাটিয়ে উঠবেন। সম্ভবত আগমী মাসের মাঝামাঝিই উত্তেজনা থেমে আসবে। কারণ এ সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভোট শেষ হবে। বাজপেয়ী আর যাই হোক বাংলাদেশের সঙ্গে কোটি কোটি রুপির বাণিজ্যিক সুবিধা, ১৬ কোটি মানুষের বাজার হারানোর ঝুঁকি নেবেন না।

'সীমান্তে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না। আমরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি।'

– মোহাম্মদ নাসিম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

'আশা করি এ ঘটনায় দু'দেশের বন্ধুসুলভ সম্পর্কে চির ধরবে না।... অভিযোগের গভীর তদন্ত করা হবে। এর মাধ্যমেই আমাদের সদ্ভাব প্রকাশ পাবে'

– সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, পররাষ্ট্র সচিব